

বিশিষ্ট সাংবাদিক
সৈয়দ আবুল মকসুদ

রক্তদাতারা প্রকৃত
নিঃস্বার্থ দাতা



কোয়ান্টাম বুলেটিন



অক্টোবর ২০১৫

বিশেষ আলোচনায় গুরুজী

কাজ করতে হবে ১৮ ঘণ্টা

প্রতিদিনের দান
পরিণত হোক অভ্যাসে



বেশ কয়েক বছর আগে আমার একজন নিকটাত্মীয়কে রক্তের অভাবে মারা যেতে দেখেছি। সেই থেকে বুঝি যে, নিরাপদ রক্ত পরিসংখ্যানের গুরুত্ব অপরিণীম। আমি জেনেছি, কোয়ান্টাম সাত লক্ষ মানুষকে বিশুদ্ধ রক্ত দিয়ে জীবন বাঁচাতে সাহায্য করেছে। আর এ কাজটি সম্ভব হয়েছে রক্তদাতাদের দানের ফলে। রক্তদাতারা আজকের সমাজে প্রকৃত নিঃস্বার্থ দাতা।

আজ তারা এখানে যা পাচ্ছেন তা একটি স্বীকৃতিমাত্র, এর চেয়েও বড় সম্মান তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। কারণ, এ দানের মূল্য অনেক বেশি। এ কাজে মানুষের দোয়া এবং একটি আত্মিক বিষয়ও জড়িত।

ভবিষ্যতেও মানুষের কল্যাণে তারা এগিয়ে আসবেন, সে শক্তি আমি এই রক্তদাতাদের মাঝে দেখতে পাই। এবং বিশ্বাস করি, তাদের মধ্য থেকেই জেগে উঠবে আগামী দিনের মহৎ মানুষ। আর উন্নত জীবনবোধ থেকে এমন একটি কাজের উদ্যোগ নেয়ার জন্যে আমি কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ জানাই।

শৈশব থেকেই আমার একটা আত্মহের বিষয় হলো, বিভিন্ন জায়গায় মহৎ কাজ করা করছেন, কী করছেন তা দেখা এবং সে-সম্পর্কে জানা। গত ৪০ বছরেরও বেশি সময় ধরে সাংবাদিকতা ও কাজের সূত্রে আমি দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় গিয়েছি। এছাড়াও গবেষণার প্রয়োজনে এ অঞ্চলের গত দশ বছরের ইতিহাস নিয়ে আমি পড়াশোনা করেছি, এর ওপর কাজ করেছি। তাতে দেখেছি, নীরব কাজই শেষপর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী হয়। মানবকল্যাণে কোয়ান্টামের কর্মপ্রয়াস দেখে আমি অভিভূত! নীরব কাজই কোয়ান্টামের সবচেয়ে বড় শক্তি।

[বিশিষ্ট সাংবাদিক কলামিস্ট লেখক গবেষক সৈয়দ আবুল মকসুদ গত ১৬ সেপ্টেম্বর কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম আয়োজিত ১১৮ তম শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হন। রক্তদাতাদের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন।]

প্রতিদিন কাজ করুন ১৮ ঘণ্টা। কাজ করুন নিজের কল্যাণে, সৃষ্টির কল্যাণে। দিন শুরু করুন দান দিয়ে। আপনার জীবনে বিষণ্ণতা হতাশা বলে কিছু থাকবে না। মুক্তি পাবেন সকল আসক্তি থেকে। আর আসক্তি থেকে মুক্ত হলে দুঃখ দারিদ্র্য অভাব পালিয়ে যাবে আপনার জীবন থেকে। তাই আপনার সকল মেধা, শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় করুন কাজের পেছনে।

অর্গানিয়ারদের এক বিশেষ কার্যক্রমে একথা বলেন গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক।

গুরুজী বলেন, অলস সময়ই হচ্ছে আসক্তির আঁতুড় ঘর। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অলস সময় যাদের রয়েছে, তারাই আসক্তির বৃত্তে আটকে যায়। আমরা যদি চারপাশে তাকাই, দেখব সমাজের অধিকাংশ মানুষই আজ নানা রকম আসক্তির বৃত্তে আটকে পড়েছে। ফলে জীবন হয়ে উঠেছে ক্রমশ জটিল ও অস্থিরতাপূর্ণ।

এ আসক্তি হতে পারে বহু রকমের। কেনাকাটা ও পণ্যাসক্তি, ফেসবুক-ইন্টারনেট-স্মার্টফোন আসক্তি, টিভি/সিরিয়াল আসক্তি থেকে শুরু করে খাদ্যাসক্তি, মাদকাসক্তি (কোমল পানীয়, এনার্জি ড্রিংকস ইত্যাদি) পর্যন্ত বিস্তৃত এর পরিধি।

এ সর্বশাসী আসক্তির ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া আজ আমরা দেখতে পাই পাশ্চাত্যের জীবন ও সমাজব্যবস্থায়। সে-দেশের সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীদের অসংখ্য গবেষণা প্রতিবেদনে ফুটে উঠেছে তাদের বর্তমান সামাজিক অন্তঃসারশূন্যতা।

দৈনন্দিন জীবনে হরদম ক্র্যাসক্তি নিয়ে রিডার্স ডাইজেস্টে (ডিসেম্বর ২০১১) প্রকাশিত একটি নিবন্ধের সূত্র ধরে তিনি বলেন, খোদ পাশ্চাত্যের গবেষকরাই বলছেন, কেনাকাটাই আজ পাশ্চাত্যের নতুন ধর্ম এবং বড় বড় শপিং-মলগুলো হলো যেন একেকটা ক্যাথেড্রাল বা বড় বড় উপাসনা কেন্দ্র।

তিনি বলেন, পাশ্চাত্যের অনুকরণে এই পণ্যাসক্তি গত কয়েক দশক ধরে ছড়িয়ে পড়েছে আমাদের দেশেও। নিজেরা সচেতন হওয়ার পাশাপাশি কোয়ান্টাম মেথডের শুরু থেকেই এ ব্যাপারে আমরা সবাইকে সচেতন করে তোলার চেষ্টা করেছি।

তখনই আমরা বলেছি, সামাজিক সম্মান এখন সততার ওপর নয়, নির্ভর করছে ক্রয় ক্ষমতার ওপর। আমরা এখন মানুষ নই। আমাদের পরিচয় হচ্ছে আমরা ভোক্তা বা ক্রেতা। আর এ কথাগুলোই এখন বলছেন পাশ্চাত্যের প্রথম সারির গবেষক ও বিশ্লেষকরা।

২০০৮ সালে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে একযোগে প্রকাশিত একটি বেস্টসেলার গ্রন্থ buyology-তে এর লেখক মার্টিন লিভস্ট্রম বলেন, 'আজ আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে যে, আমরা সবাই ক্রেতা। মোবাইল ফোন, প্রসাধনী কিংবা কোমল পানীয় যা-ই আমরা কিনি না কেন, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটা বড় অংশ জুড়েই আছে কেনাকাটা।'

এছাড়াও আছে ইন্টারনেট আসক্তিসহ বহু রকম মিডিয়া আসক্তি। অথচ বিশ্বজুড়ে স্বাস্থ্য-গবেষকরা বলছেন, মানবদেহের সার্বিক সুস্থতার পথে এটি অন্তরায়। দিনের একটি বড় সময় জুড়ে মোবাইল, ইন্টারনেট সময় কাটানোর দরুন সৃষ্টি হয় স্ট্রেস। ফলশ্রুতিতে শরীরের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ক্রমশ দুর্বল হয়ে যাওয়ার পাশাপাশি দেখা দিতে পারে নানারকম মনোদৈহিক জটিলতা।

গুরুজী বলেন, জীবন একটাই। সার্বিক সুস্থতা ও কর্মোদ্যমের মধ্য দিয়ে সৃষ্টির প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনের এটাই সুযোগ। তাই আসক্তির বৃত্ত ভেঙে আমাদের বিচরণ করতে হবে কাজের আনন্দলোকে। তাহলেই আমরা প্রশান্তি ও প্রাচুর্যের সন্ধান পাব।

দাতা হোন। দাতার কখনো অভাব হয় না। দাতার জীবনেই আসে প্রাচুর্য, আসে স্থায়ী সুখ। দাতা হতে হলে দান করতে হবে নিয়মিত। পরিমাণটা হবে আপনার সাধ্যমতো। তা হতে পারে ৫, ১০, ২০, ৫০০ বা হাজার টাকা। যা-ই দিন, দিতে হবে প্রতিদিন। তাই সকালে নাশতার আগেই দানের টাকা জমা দিন মাটির ব্যাংকে। আল্লাহর দরবারে দাতার তালিকায় লিপিবদ্ধ হোক আপনার নাম। সমস্ত অকল্যাণ দূর হোক আপনার জীবন থেকে।

আর সকালে আপনি তৃপ্তি নিয়ে নাশতা করতে পারবেন এই ভেবে যে, আপনার ক্ষুদ্র দান হয়তো জোগাবে কোনো নিরন্তর অনু, আলোকিত করবে কোনো এতিম-অনাথের জীবন।

গুরুজীর এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইতোমধ্যেই কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা এই চর্চা শুরু করেছেন। গ্রাজুয়েট প্রো-মাস্টার আর্ডেন্সিয়ারদের পাশাপাশি এসোসিয়েটরাও এটি অনুসরণ করছেন। দিনের শুরুতে দান পরিণত হচ্ছে কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যদের নিয়মিত অভ্যাসে।

প্রতিদিন সকালে নাশতার আগেই তারা দান করছেন মাটির ব্যাংকে। উপকৃতও হচ্ছেন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। কারো প্রশান্তি বেড়েছে, কেউ মুক্ত হয়েছেন অহেতুক দৃষ্টিভ্রান্তি থেকে, কেউ সারাদিনের কাজগুলো করতে পারছেন সময়মতো, আগের চেয়ে বেড়েছে সুস্থতা ও প্রাণবন্ততা। অপচয় কমেছে, আয়ে বরকত এসেছে। পরিবারে এসেছে সুখ ও সমৃদ্ধি।

কর্মসূচি : অক্টোবর

প্রথমায়ন ওরিয়েন্টেশন

২৩ ও ২৪ অক্টোবর। কাকরাইল
কোয়ান্টাম শিক্ষার্থী ওরিয়েন্টেশন
৩০ ও ৩১ অক্টোবর। যাত্রাবাড়ী
হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় ওরিয়েন্টেশন
২৩ ও ২৪ অক্টোবর। বনশ্রী

ড. নূরুর রহমান খান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান। কথাসাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলীর জীবন ও কর্মের ওপর তার রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ও সাহিত্যকর্ম। 'সৈয়দ মুজতবা আলী : জীবনকথা' এবং 'মুজতবা-সাহিত্যের রূপবৈচিত্র্য ও রচনামণ্ডলী' তার রচিত দুটি উল্লেখযোগ্য গবেষণাগ্রন্থ। বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ও সংস্কৃত বিভাগের খণ্ডকালীন শিক্ষক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থার পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। অধ্যাপক নূরুর রহমান কোয়ান্টাম মেথডের ২২৩ ব্যাচে অংশ নেন। তার সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে আমাদের এবারের প্রতিবেদন।

চিন্তের বিকাশ ও সমাজের কল্যাণে কাজ করছে কোয়ান্টাম

অধ্যাপক ড. নূরুর রহমান খান

১৯৯৬ সালের কথা। আমার স্ত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তার চিকিৎসার জন্যে রক্তের প্রয়োজন হলো। রক্ত দিলেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের নিবেদিতপ্রাণ সুরাইয়া রহমান এবং আরেকজন সদস্য। তখন কোয়ান্টামের নিজস্ব কোনো ল্যাব ছিল না, কারো রক্তের প্রয়োজন হলে কোয়ান্টাম পরিবারের সেবাব্রতী সদস্যরা বিভিন্ন ক্লিনিক-হাসপাতালে গিয়ে রক্তদান করে আসতেন।

ইতঃপূর্বে আমার স্ত্রী পুত্র কন্যা এবং নিকটাত্মীয়রা কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিয়েছিলেন। মূলত তাদেরই অনুপ্রেরণায় পরে আমিও কোর্সটি করি। এবং বেশ চমৎকৃত হই।

হাজার বছর আগে আমাদের এ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে চর্চিত একটি বিষয় ছিল এই ধ্যান। সাধনার প্রাচীন এ পদ্ধতিটি আমাদের জীবন থেকে অবলম্বন হয়ে গিয়েছিল প্রায়। একে আবার নতুন করে প্রাণদান করল কোয়ান্টাম। আধুনিক মানুষের মনোদৈহিক ও সার্বিক কল্যাণার্থে একে সঞ্জীবিত করেছেন আমাদের গুরুজী। একটি বড় লক্ষ্যকে সামনে রেখে ধ্যান বা মেডিটেশনকে তিনি করে তুলতে চাইছেন আমাদের একটি নিত্য অভ্যাস।

প্রায় দু-দশক ধরে আমি দেখেছি, কোয়ান্টাম যে শুধু ব্যক্তিমানুষের কল্যাণ ও জাগরণের প্রতিই মনোযোগী, তা নয়; এর পরিধি বাড়ার সাথে সাথে সমাজের নানা প্রয়োজনে সজ্ঞবদ্ধভাবে এগিয়ে এসেছেন কোয়ান্টাম পরিবারের সর্বস্তরের সদস্যরা।

নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালনের জন্যে সবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানে অত্যাধুনিক ল্যাব প্রতিষ্ঠা, প্রসূতি মায়াদের জন্যে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা এবং বান্দরবানের লামায় স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বিত্তহীন পরিবারের শিশুদেরকে বুদ্ধিমান, খেলাধুলা ও উন্নত জীবনের আলোয় আলোকিত করার চেষ্টা ইত্যাদি কার্যক্রমগুলো সত্যিকার অর্থেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বছর কয়েক আগে আমার কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজে আমি গিয়েছিলাম। সে-বছরের ভর্তি পরীক্ষাটা দেখার সুযোগ হয়েছিল আমার। সুযোগ ঘটেছিল ওখানে ভর্তিচ্ছু পাহাড়ি বাঙালি শিশুদের দেখার এবং ওদের বাবা-মা-অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে অনেক কিছু জানার।

সে-বার দেখেছিলাম, অধিকাংশ দরিদ্র দুস্থ বঞ্চিত পরিবারের শিশুদের

পাশাপাশি ওখানে ভর্তি হতে এসেছে সচ্ছল পরিবারের শিশুরাও। তেমনি এক শিশুর অভিভাবক আমাকে এসে বললেন, স্যার, আমার ছেলেটাকে আপনাদের স্কুলে ভর্তি করে নিন। জানতে চাইলাম, তিনি কেন এত দূর থেকে এখানে এসেছেন। চাইলে তো পয়সা খরচ করে শহরের স্কুলে ভর্তি করাতে পারেন সন্তানকে।

তিনি বললেন, 'আমাদের এলাকায় একটি হতদরিদ্র পরিবার আছে, নোংরা অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে ওদের বসবাস। তাদের একটি সন্তান গত বছর এ স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। তিন/ চার মাস পর যখন সে প্রথম বাড়ি গেল, দেখি, বেশ পরিপাটি পরিচ্ছন্ন সুন্দর একটি শিশু। তার আচার-আচরণ চলাফেরা সবকিছুর মধ্যেই অনেক পরিবর্তন! আমার বাচ্চাটা এ স্কুলে ভর্তি হতে পারলে ওর জীবনটাও বদলে যাবে, স্যার।'

তার আকৃতি দেখে খুব অবাক হলাম। আমার মনে হলো, সন্তানদের পড়াশোনা ও সুন্দর বিকাশের জন্যে সব অভিভাবকই চায় এমন একটা পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের জায়গা। কোয়ান্টাম সেটাই দিতে পেরেছে।

এর কিছুদিন পর আবার যাওয়ার সুযোগ হলো ওখানে। ইচ্ছে ছিল, আগের বার যে শিশুদের ভর্তি করেছিলাম তাদের দেখব-ওরা কেমন আছে, কী করছে।

একদিন সকালে স্কুলের মাঠে বসে আছি। বাচ্চাদের খেলাধুলা দেখছি। এমন সময় এক ক্ষুদ্র শিক্ষার্থী আমার কাছাকাছি এসে দাঁড়াল। একটু একটু করে এগিয়ে এসে বসল প্রায় আমার কোল ঘেষে। বলল, 'স্যার, আপনি কোথেকে এসেছেন?' বেশ সপ্রতিভ আর সাহসী সেই ছেলেটি। তার সাথে অনেক কথা হলো। ক্লাস টু-তে পড়ে সে। বাবা রিকশা চালায়, মা অন্যের বাড়িতে কাজ করে। বললাম, কেমন লাগে এখানে? সে বলল, খুব ভালো।

একপর্যায়ে আমাকে বেশ অবাক করে দিয়ে ছেলেটি বলল, 'স্যার, আপনার ছেলে আছে?' বললাম, 'আছে, কেন?' সে বলল, 'ওকে এখানে ভর্তি করে দেন স্যার। আমাদের স্কুলে অনেক আনন্দ। সবকিছুই খুব সুন্দর। ও এই স্কুলে ভর্তি হলে আমাদের সাথে অনেক আনন্দে থাকবে।'

তার কথা শুনে হেসে ফেললাম। বললাম, ভর্তি তো করতেই চাই, কিন্তু এখন তো আর ভর্তি করা যাবে না। সে যে এখন অনেক বড় হয়ে গেছে!

ছেলেটির স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস দেখে একটা আশাবাদ অনুভব করেছিলাম নিজের ভেতরে। শৈশব থেকেই কল্যাণ চেতনায় উদ্ভুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত এই ছেলেটিই যখন একদিন বড় হবে; সমাজ

ও দেশের জন্যে কাজ করবে তখন এই দেশ তো আর আজকের দেশ থাকবে না। পরিবর্তন আসবেই।

উন্নত বিশ্বে এ কাজগুলো করে রাষ্ট্র কিংবা সমাজের বিত্তবান মানুষেরা। আমাদের সমাজেও বিত্তবান অনেকেই আছেন বটে, কিন্তু চিন্তবান সকলেই নন। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন তার সব ধরনের কাজ ও উদ্যোগের মধ্য দিয়ে মানুষকে চিন্তবান করে তুলছে। চিন্তের গুণ্ণমা করছে। ধ্যান ও সেবার পথ ধরে মানুষকে জাগিয়ে তুলছে। সব মিলিয়ে বলতে পারি, চিন্তের বিকাশ ও সমাজের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে কোয়ান্টাম।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও অনুলিখন : ডা. আতাউর রহমান



সেন্ট্রাল উইমেন'স ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন অধ্যাপক সহধর্মিণী ফিক্রিয়া বেগম (৩০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট), জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ও বর্তমানে স্কটল্যান্ডের এবার্ডিন ইউনিভার্সিটিতে পি-এইচ.ডি গবেষণারত কন্যা সুমাইয়া ফারাহ খান এবং যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডে অবস্থিত নাসা-য় (NASA) পোস্ট ডক্টরাল গবেষণাকর্মে নিয়োজিত পুত্র রুবায মো. ইমরোজ খান সৌরভের (উভয়েই ৪২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট) সাথে অধ্যাপক নূরুর রহমান খান

মেডিটেশন ও সুস্থ জীবনাচার বিষণ্নতা প্রতিরোধ ও নিরাময় করে

আপনার প্রতিবেশী যখন চাকরি হারায় সেটা মন্দা (Recession), আপনি হারালে যা ঘটে সেটাই বিষণ্ণতা (Depression)। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান কথাটা হয়তো বলেছিলেন কিছুটা কৌতুকচ্ছলেই। কিন্তু বিষণ্ণতার কবলে পড়েন যিনি, তিনিই কেবল বোঝেন এর প্রতিদিনকার যন্ত্রণা আর মর্মবেদনা। অগণিত ভোগ্যপণ্য আর নিত্যনতুন প্রযুক্তির ভিড়ে মানুষ যখন ক্রমাগত হারিয়ে ফেলেছে নিজেকেই, তখন বিশ্বজুড়ে বিষণ্ণতার প্রকোপ বাড়ছে, এ আর অস্বাভাবিক কী!

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, বর্তমানে পৃথিবীজুড়ে ৩৫ কোটিরও বেশি মানুষ নানা মাত্রায় বিষণ্ণতার শিকার। এ এখন আর নির্দিষ্ট কোনো বয়সের সীমায় আটকে নেই। '৬০-এর দশকে বিষণ্ণতা-আক্রান্ত হওয়ার গড় বয়স ছিল ২৯ বছর, এখন তা নেমে এসেছে ১৪-তে!

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল কলেজ হেলথ সার্ভে-র অধীনে সে-দেশের কলেজ-ছাত্রদের ওপর বিষণ্ণতার প্রকোপ নিয়ে একটি অনুসন্ধান চালানো হয়। কয়েক বছর ধরে পরিচালিত ব্যাপক আকারের এ গবেষণা থেকে বেরিয়ে আসে রীতিমতো ভয়াবহ তথ্য। যুক্তরাষ্ট্রের কলেজ-ছাত্রদের শতকরা ৪৫ ভাগ মোটামুটিভাবে বিষণ্ণতা-আক্রান্ত। আর শতকরা ৮০ জনই রয়েছে বিষণ্ণতা-ঝুঁকিতে।

বিষণ্ণতার কারণ, প্রতিকার ও এটি প্রতিরোধের কার্যকর উপায় নিয়ে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বিষণ্ণতা প্রতিরোধ ও নিরাময়ের কয়েকটি উপায় বাতলে দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

চাই গভীর ঘুম

অনিদ্রা বা গভীর ঘুমের অভাব বিষণ্ণতার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। ঘুম আর বিষণ্ণতার মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কটি বিপরীতমুখী। বিষণ্ণতা ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়, আবার অগভীর ঘুম ঠেলে দেয় বিষণ্ণতার দিকে। অর্থাৎ ঘুম ভালো না হলে বিষণ্ণতার মাত্রা বাড়ে, আর এর মাত্রা যত বাড়ে ঘুম ক্ষতিগ্রস্ত হয় ততটাই। এ এক দুষ্টচক্র, কিছুদিন টানা চলতে থাকলে যা পরিস্থিতিতে নিয়ে যেতে পারে আরো খারাপের দিকে।

তাই প্রতিদিন পর্যাপ্ত ঘুমান। আপনার ঘুমের সঠিক পরিমাণ নির্ভর করে আপনার জীবনযাত্রা ও বয়সের ওপর। গবেষকরা বলেন, স্বাভাবিকভাবে দিনে প্রয়োজন গড়ে ছয় ঘণ্টা ঘুম।



ব্যায়াম : ওষুধের চেয়েও কার্যকর

ব্যায়ামের সাথে মনোদৈহিক সুস্থতার সুসম্পর্ক নিয়ে গবেষণা হয়েছে বিস্তার। বলা হচ্ছে, এ-সংক্রান্ত গবেষণায় বিপ্লব ঘটে গেছে। আর তার ফলে মনের সুস্থতার জন্যে শারীরিক পরিশ্রমের গুরুত্ব নতুনভাবে উপলব্ধি করছেন মনোবিদরা।

যুক্তরাষ্ট্রের ডিউক মেডিকেল স্কুলের গবেষক মিশেল ব্যাবিয়াক ও তার সহযোগীরা এ-সম্পর্কিত একটি গবেষণা পরিচালনা করেছেন, যেখানে তীব্র বিষণ্ণতা-আক্রান্ত ১৫৬ জন রোগীকে নির্বাচন করা হয়—যারা অনিদ্রা ও ক্ষুধামান্দ্যায় ভুগছিলেন, এমনকি আত্মহত্যার চিন্তাও তাদের পেয়ে বসেছিল।

১৫৬ জনকে তিনটি গ্রুপে ভাগ করেন গবেষকরা। প্রথম গ্রুপকে সপ্তাহে তিন দিন আধঘণ্টা করে হালকা ব্যায়ামের পরামর্শ দেয়া হয়। দ্বিতীয় গ্রুপকে দেয়া হয় বিষণ্ণতার চিকিৎসায় ব্যবহৃত প্রচলিত ওষুধ। তৃতীয় গ্রুপকে ব্যায়াম এবং ওষুধ দুয়েরই পরামর্শ দেয়া হয়।

চার মাস পর পাওয়া গেল অভূতপূর্ব ফলাফল। তিনটি গ্রুপের মধ্যে শতকরা ৬০ জনেরই অবস্থার উন্নতি ঘটেছে। অর্থাৎ বিষণ্ণতা প্রতিকারে ব্যায়াম ওষুধের মতোই কার্যকর।

না, এখানেই শেষ নয়। সুস্থ হওয়া রোগীদের ছয় মাস পর ফলো-আপ করলেন ব্যাবিয়াক। রিপোর্টে দেখা গেল, যারা ওষুধ সেবন করেছিলেন তাদের শতকরা ৩৮ জন এবং যারা ব্যায়াম ও ওষুধ দুয়েরই সাহায্য নিয়েছেন তাদের শতকরা ৩১ জন পুনরায় বিষণ্ণতা-আক্রান্ত হয়েছেন। আর যারা শুধু ব্যায়াম করেছেন তাদের পুনরায় আক্রান্ত হওয়ার হার মাত্র শতকরা ৯ ভাগ।

উপসংহারে বলা হয়, বিষণ্ণতা রোধে ওষুধের চেয়েও ব্যায়াম দীর্ঘমেয়াদে অধিকতর কার্যকরী। গবেষকরা বলছেন, হাজারো গবেষণায় এটি এখন প্রমাণিত যে, আমাদের মনোদৈহিক সুস্থতার জন্যে ব্যায়াম দারুণভাবে উপকারী এবং বিষণ্ণতা রোধে এটি সর্বোত্তম পন্থা।

মেডিটেশন আপনাকে সুখী করে

আমাদের সার্বিক সুস্থতার জন্যে মেডিটেশন আজ পরীক্ষিত পদ্ধতি। দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের পর বিজ্ঞানীরা রায় দিচ্ছেন, দৃষ্টিশক্তি ও বিষণ্ণতার মতো পরিস্থিতি থেকে রেহাই পেতে মেডিটেশন অন্যতম শক্তিশালী হাতিয়ার। আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম সহযোগে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তারা বুঝতে সমর্থ হয়েছেন নিয়মিত মেডিটেশন চর্চাকারীদের মস্তিষ্কের গঠন ও গতিপ্রকৃতি।

মানব মস্তিষ্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্স। এর বাম দিকটি যাদের বেশি সক্রিয় তারা সুখী। ডান দিকটি বেশি সক্রিয় যাদের তারা কিছুটা মনমরা, বিষণ্ণ। ইইজি ও এমআরআই-এর সাহায্যে নিয়মিত মেডিটেশন চর্চাকারী সন্ন্যাসীদের মস্তিষ্ক পর্যবেক্ষণ করে বিজ্ঞানীরা বলছেন,

তাদের প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্সের বাম দিকটি তুলনামূলক বেশি সক্রিয়। তারা ইতিবাচকতায় উদ্দীপ্ত এবং নেতিবাচক আবেগের মুখে ততটাই দৃঢ়, অটল।

গবেষকরা জানাচ্ছেন, মেডিটেশনের সুফল পেতে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীদের মতো এটি সারাদিন চর্চা করতে হবে তা নয়, দিনে ১৫ মিনিট ধ্যানচর্চাও এনে দিতে পারে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন।

রক্তে শর্করা-মান থাকুক নিয়ন্ত্রণে

বিষণ্ণতা রোধে রক্তের শর্করা-মান নিয়ন্ত্রণ একটি কার্যকরী পদক্ষেপ। রক্তের শর্করা-মান কমে গেলে বিষণ্ণতা এসে ভিড়তে পারে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, শরীর আর মন পরস্পর গভীরভাবে সংযুক্ত। একটি বিকল হলে পিছু নেয় অন্যটিও।

সাধারণত রক্তে শর্করা-ধস (Low Blood Sugar) নামে শর্করা-তুঙ্গতার (High Blood Sugar) পথ ধরেই। তাই রক্তে শর্করার পরিমাণ অতিরিক্ত বাড়তে না দেয়াটাই হবে শর্করা-ধস ঠেকানোর মোক্ষম উপায়। আর এজন্যে একবারেই বেশি নয়, বরং একই পরিমাণ শর্করা সারাদিনে খাওয়া চাই ভাগ ভাগ করে। সাথে পরিমাণ মতো প্রোটিন ও ফ্যাটের পাশাপাশি চাই প্রচুর আঁশ-জাতীয় খাবার (ন্যূনতম ১২ গ্রাম/ হাজার ক্যালরি)।

খুঁজে নিন আপনার আনন্দের কাজটি

আপনার পছন্দের কিংবা ভালোলাগার কাজ কোনটি, সবচেয়ে ভালো জানেন তা আপনিই। সে কাজে ডুবে গেলে দৃষ্টিশক্তি ক্রমে কষ্টের কোনো অনুভূতিই স্পর্শ করে না আপনাকে। আত্মমগ্ন হয়ে পড়েন আপনি। সে-কাজে সময় দিন। তা নিয়ে আনন্দময় সময় কাটান। আপনি ভালো থাকবেন। বিষণ্ণতার স্মৃতি থাকবে অনেক দূরে।

তাই আপনার পছন্দের কাজটি খুঁজে বের করা জরুরি, যে কাজের আনন্দ কখনো ফুরিয়ে যায় না। হতে পারে তা ছবি আঁকা, লেখা, খেলাধুলা কিংবা আত্ম উন্নয়নমূলক কাজে সময় ব্যয় এবং মানুষের জন্যে কাজ করা।

একা নয়, থাকুন একসাথে

মহীয়সী মাদার তেরেসার কথা হলো, 'একাকিত্ব আর মমতাহীনতার অনুভূতিই সবচেয়ে ভয়াবহ দারিদ্র্য।' বলা যায়, সেই দারিদ্র্যই ভুগছে আধুনিক মানুষ। এত পণ্যের অবিরাম প্রাচুর্য, কিন্তু বাড়ছে স্বজনহীন মমতাহীন নিঃসঙ্গ দিনযাপনের ঘটনা।

আজকের পৃথিবীতে বিষণ্ণতার হার বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ এটিই, বলছেন গবেষকরা। সামাজিক সম্পর্কগুলোতে তো বটেই, চিড় ধরেছে পারিবারিক সম্পর্কের উষ্ণতায়ও। অতিরিক্ত চাপ, টিভি আর হরেক রকম প্রযুক্তি ভীষণভাবে প্রভাবিত করছে আমাদের প্রিয় সম্পর্কগুলোকে।

অথচ, বন্ধু স্বজন প্রতিবেশীদের সাথে হাসি-আনন্দে সময় কাটানোকে স্বাস্থ্যকর সামাজিক পন্থা (Healthy Social Medicine) হিসেবে অভিহিত করেছেন বিশেষজ্ঞরা। তারা বলেন, নিঃসঙ্গ মানুষের ওপরই বিষণ্ণতার আক্রমণ বেশি। আবার বিষণ্ণতা পেয়ে বসে যাদের, তারাও একাকীই থাকতে চান। এতে বিষণ্ণতা বাড়বে বৈ সারে না।

তাই পরিবারের সাথে সময় কাটান, বন্ধু আত্মীয় পরিজনদের সুখ-দুঃখের সাথি হোন। মমতা দিন। একা নয়, থাকুন একসাথে। পরিবারের সাথে। সবচেয়ে বড় কথা, মানুষের সাথে। সবার সাথে। সবার পাশে। বিষণ্ণতা ধারেকাছে আসার সুযোগই পাবে না!

মেডিটেশন চর্চায় শিক্ষা-সাফল্য

আমিও পারি-এই বিশ্বাসই আমাকে দিল কোয়ান্টাম

জয়নাব বিনতে হোসেন

অনার্সে প্রথম সেমিস্টারে রেজাল্টের পর দেখা গেল ১০০ জনের পরে আমার স্থান। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাকে সঠিক দিক-নির্দেশনা দেয়ার কেউ ছিল না। পেরিয়ে আসা শিক্ষার্থী জীবনে কখনো ক্লাসে ১ম হই নি। তাই আমার পক্ষেও যে কখনো ১ম হওয়া সম্ভব, এই বিশ্বাসও আমার ভেতরে ছিল না।

এরপর হঠাৎ করেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত কোয়ান্টামের শিক্ষার্থী সেমিনারের খোঁজ পেলাম। অংশ নিতে শুরু করলাম নিয়মিত। ধীরে ধীরে আমার আত্মবিশ্বাস বাড়তে লাগল। সিদ্ধান্ত নিলাম কোর্স করার। কোর্সে মনোবি নিৰ্মাণ করলাম, ক্লাসে ১ম হবো। শুরু করলাম প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি, পরিশ্রম আর মেডিটেশন। এরপর ধারাবাহিকভাবেই ক্লাসে ১ম হতে লাগলাম। পাশাপাশি নিয়মিত অংশ নিয়েছি কোয়ান্টামের প্রোগ্রামগুলোতে। আর যখনই সুযোগ পেয়েছি কোয়ান্টামের হিসেবে কাজ করেছি।

বিশ্বাস করি, এরই ফলস্বরূপ অনার্সে আমি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়েছি। সম্প্রতি ভালো ফলাফলের জন্যে পেয়েছি ড. শহীদুল্লাহ জ্ঞানপীঠ পুরস্কার। প্রতিষ্ঠার প্রতি কৃতজ্ঞতা যে, তিনি আমাকে কোয়ান্টামের সংস্পর্শে আসার সুযোগ দিয়েছেন।

[জয়নাব বিনতে হোসেন, মাস্টার্সের শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ৩৭০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

মনোবি পূরণ হলো

জ্যাকি মার্মা

কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে ভর্তি হওয়ার পরে প্রথমদিকে আমার রেজাল্ট খুব একটা ভালো ছিল না। এমনকি চতুর্থ শ্রেণিতে থাকতে পরীক্ষায় ফেলও করলাম। ফলে আরো একবছর একই ক্লাসে পড়তে হলো।

ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার সময় কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিলাম। কোর্সে এসে আমার আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে গেল। এরপর লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগ ও আগ্রহ ফিরে পেলাম নতুন করে। রেজাল্টও বেশ ভালো হতে শুরু করল।

কিন্তু জেএসসি পরীক্ষায় জিপিএ এলো ৪.৮৬। ইংরেজিতে এ প্লাস পেলাম না। হতাশ না হয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম, নিজের ভুলগুলো খুঁজি বের করব এবং পরবর্তী পরীক্ষার জন্যে পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করব। প্রতিদিন মনোবিদ্যার মেডিটেশনে দেখতাম, এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পেয়েছি। সাথে চলল রুটিন করে পড়ালেখা। সত্যিই এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলো জিপিএ ৫ পেয়ে।

[জ্যাকি মার্মা, দ্বাদশ শ্রেণি, কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ, বান্দরবান। ২৮৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



সফল জীবনের অভিযাত্রায় জয়ী হওয়ার অফুরন্ত সম্ভাবনা রয়েছে প্রতিটি শিক্ষার্থীর মধ্যেই। কিন্তু পারিপার্শ্বিক নেতিবাচকতার বৃত্তে আটকে গিয়ে অধিকাংশই একসময় হয়ে পড়ে ব্যর্থ হতাশ লক্ষ্যহীন। উপযুক্ত মেধা যোগ্যতা সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পৌঁছতে পারে না তাদের কাক্ষিত গন্তব্যে। আবার সমাজে একটি প্রচলিত ধারণা হলো, যে-কোনো উপায়ে পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে হবে। কিন্তু ক্লাসে ১ম হওয়ার সুস্পষ্ট কারণগুলো তুলে ধরা ও প্রয়োজনীয় কৌশলসমূহ শেখানোর কোনো প্ল্যাটফর্ম যেমন থাকে না, তেমনি থাকে না একজন শিক্ষার্থীকে মানবিক গুণসম্পন্ন ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার কোনো সচেতন প্রয়াস।

আমরা বলতে পারি, সাফল্যের ব্যাপারে এই খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এবং একজন শিক্ষার্থীকে মেধাসম্পন্ন কল্যাণকামী মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার কার্যকর পথ কোয়ান্টাম। এর পাশাপাশি শিক্ষায় সাফল্যের জন্যে মনোযোগ, অধ্যবসায় ও রুটিন করে পড়াশোনার সুত্রগুলো সহজ করে দেয় মেডিটেশন চর্চা। সেইসাথে সৎসঙ্কল্পের ইতিবাচক বলয়ে থাকার ফলে সে উপলব্ধি করতে পারে শিষ্টাচার, সততা ও নৈতিকতার গুরুত্ব।

গত ২৩ বছরে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিয়েছে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া হাজারো শিক্ষার্থী। মেডিটেশন ও চিরায়ত সাফল্যসূত্রগুলো আন্তরিকভাবে চর্চা করে তারা হতাশা লক্ষ্যহীনতা সংকোচ জড়তা আসক্তি পরীক্ষাভীতি-এমনি নানা সমস্যাকে রূপান্তরিত করেছে নতুন সম্ভাবনায়। উপরন্তু, সঙ্গে একাত্মতা তাদের জীবনে সৃষ্টি করেছে জীবনে ১ম হওয়ার অনুপ্রেরণা। এরকমই কয়েকজন শিক্ষার্থীর অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা নিয়ে এবারের আয়োজন।

অনার্স মাস্টার্স দুটোতেই ফাস্ট ক্লাস পেলাম

মো. জসীম উদ্দীন

এইচএসসি পরীক্ষার প্রথমদিন টেনশনে পরীক্ষা কেন্দ্রেই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। ডাক্তার সব দেখে শুনে আমার অভিভাবককে বললেন, 'এই ছেলের দ্বারা পড়ালেখা হবে না। অন্য কোনো কাজে লাগিয়ে দিন।'।



এরপর থেকে ডাক্তারের দেয়া কড়া ঘুমের ওষুধ খেয়ে বেশিরভাগ সময় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে থাকতাম।

কলেজ পেরিয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পরও পরীক্ষাভীতি কাটল না। অসুস্থ হয়ে পড়তাম পরীক্ষার আগে আগে। ফলে ছয়টি সেমিস্টারে ইমপ্রুভমেন্ট পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। এরপর কোয়ান্টামের খোঁজ পেলাম।

কোর্সের তৃতীয় দিন নিরাময়ের মেডিটেশনের পর ঘুমের ওষুধগুলো ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলে দিলাম। নিয়মিত মেডিটেশন ও অটোসাজেশন চর্চার পাশাপাশি ফাউন্ডেশনের সাথে একাত্ম হতে শুরু করলাম ধীরে ধীরে।

যে আমি ছিলাম পরিবারের সবচেয়ে রোগা সদস্য, সেই আমিই এখন পুরোপুরি সুস্থ এবং পরিবারের আস্থাভাজন। শিক্ষার্থী প্রোগ্রামে শেখা টেকনিকগুলো অনুসরণ করে চমৎকার ফল পেলাম। অনার্স ও মাস্টার্স দুটোতেই ফাস্ট ক্লাস অর্জন করলাম। সেইসাথে বিসিএস-এর মতো তীব্র প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রথমবার অংশ নিয়েই সাফল্যের সাথে চূড়ান্তভাবে শিক্ষা ক্যাডারে নির্বাচিত হতে পেরেছি। সঙ্কল্পের সাথে একাত্ম থাকতেই সম্ভব হয়েছে আমার এ অর্জন।

[মো. জসীম উদ্দীন। ৩৩১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

ভালো কাজ করার সাহস যুগিয়েছে কোয়ান্টাম

জান্নাতুল হাসিন লিজা

একদিন ট্রেনে করে ঢাকা থেকে রা জ শা হী তে ফিরছিলাম। ট্রেনে সেদিন প্রচণ্ড ভিড়। যাত্রীদের অনেকেই দাঁড়িয়ে আছেন। আমি সিটে বসেই খেয়াল করলাম বেশ প্রবীণ একজন ভদ্রলোক সামনের সিটে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। যখন তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন তখন সিটের হাতলে বসছেন। অথচ সেই সিটে বসা কয়েকজন তরুণ নির্বিকারভাবে বসেই আছে।

এদিকে আমার পাশে বসা আপু ব্যাপারটা কীভাবে নেবেন, এটা ভেবে ভদ্রলোককে আমার সিটও ছেড়ে দিতে পারছি না। অবশেষে আপুর অনুমতি নিয়ে সেই ভদ্রলোককে আমার সিটে বসতে বললাম। বেশ অনুরোধের পর তিনি বসলেন।

এরপর ঘটল অপ্রত্যাশিত ঘটনা। আধাঘন্টাও পেরোয় নি, পুরো কামরার পরিস্থিতি বদলে গেল। সামনের সিটের দুই তরুণ তাদের সিটে এক দম্পতিকে বসতে দিলেন। সামনে পেছনে আরো কয়েকজন তরুণ তাদের সিট ছেড়ে দিলেন প্রবীণদের, মহিলাদের বসার সুযোগ করে দিতে।

আমি উপলব্ধি করলাম, অন্যের জন্যে কল্যাণকর কাজে এগিয়ে যাওয়ার এই সাহস আমার ভেতরে জাগ্রত করেছে কোয়ান্টাম। এখানে এসেই আমি শিখেছি, শুধু ক্লাসে ভালো রেজাল্ট করাটাই শেষ কথা নয়, একজন শিক্ষার্থীকে একইসাথে ভালো মানুষও হতে হবে।

[জান্নাতুল হাসিন লিজা, মাস্টার্সের শিক্ষার্থী, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। ৩৩৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

লক্ষ্যকে বড় করতে শিখিয়েছে মেডিটেশন

মোহাম্মদ জাহিন সৌভিক



পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক নানা কারণে প্রায় দুই বছর পড়াশোনা করতে পারি নি। এমনকি সমস্যাগুলো শেষার করব এরকম কাউকেও পাই নি। পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হয় কিনা, এ ভয় আমাকে আচ্ছন্ন

করে ফেলে। সবকিছু অর্থহীন মনে হতো।

জীবনের এ পর্যায়ে এসে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিই। নতুন করে ভবিষ্যৎ নির্মাণের ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে উঠি কোর্সের একেকটি আলোচনা শুনে। সেইসাথে বুঝতে পারি যে, পরীক্ষা নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। বরং প্রত্যেকের মেধা ও যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ করে দেয়ার জন্যেই এই পরীক্ষা।

পরবর্তীতে নিয়মিত মেডিটেশন করায় আমার মনোযোগ ও স্মৃতিশক্তি আগের চেয়ে বেড়েছে। রেজাল্টও হচ্ছে আশানুরূপ। এছাড়া বিতর্কসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারছি আত্মবিশ্বাসের সাথে। সম্প্রতি মডেল ইউনাইটেড নেশনস্ নামে বড় একটা বিতর্কের আসরে ৬০ জন বক্তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বক্তা হিসেবে পুরস্কার পেয়েছি।

আমি বিশ্বাস করি, এ পর্যন্ত আমার জীবনে যতটুকুই সাফল্য এসেছে, কোয়ান্টামে না এলে সেটা ভাবতেই পারতাম না। আমার লক্ষ্যকে বড় করতে শিখিয়েছে কোয়ান্টাম।

[মোহাম্মদ জাহিন সৌভিক, শিক্ষার্থী, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়। ৩৭৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

গণিতভীতি দূর হলো

সামিয়া জাহান

গণিতে বরাবরই আমি খুব কম নম্বর পেতাম। এর একটা ই কারণ, তা হলো পরীক্ষাভীতি। গণিতের প্রশ্ন দেখে এত ঘাবড়ে যেতাম যে, প্রস্তুতি ভালো থাকলেও অঙ্ক মিলতে চাইত না এবং কখনো পুরো প্রশ্নের উত্তর করতে পারতাম না। এই সমস্যা নিয়ে সবসময় হতাশায় ভুগতাম।



ক্লাস নাহিনে পড়ার সময় কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিলাম। শিখলাম কীভাবে সমস্যার মুখে হার না মেনে সমাধানের চেষ্টা করতে হয়।

কোর্সের মাস দুয়েক পর দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা হলো। দেখলাম, গণিত পরীক্ষার দিন আমার আর ভয় লাগছে না। প্রশ্নপত্র জটিল হলেও প্রতিটি অঙ্ক সঠিকভাবে মেলাতে পারলাম এবং পুরো প্রশ্নের উত্তরও লিখতে পারলাম। সেই পরীক্ষায় আমার ক্লাসের চারটি শাখা মিলিয়ে গণিতে সর্বোচ্চ নম্বর পেলাম আমি।

[সামিয়া জাহান, শিক্ষার্থী। ৩০০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

চেষ্টা করি মেডিটেশন দিয়ে দিন শুরু করতে

সারাফ মাহনাজ

মেডিটেশন শেখার আগে আমার স্বপ্নগুলো ছিল সীমাবদ্ধ। বড় কিছু করার সামর্থ্য যে আমার ভেতরেও আছে, তা কোয়ান্টামে আসার আগে কখনোই উপলব্ধি করতে পারি নি।

আগে পড়াশোনা নিয়ে খুব দৃষ্টিহীন হতো, ফলে কোনো কাজই ঠিকমতো শেষ করতে পারতাম না। কোর্স করার পর থেকে প্রতিদিন সকালে মেডিটেশনে সারাদিনের কাজের ছক ঠিক করি, ফলে সবকিছুই সময়মতো করা অনেক সহজ হয়ে যায়।

স্কুলজীবনে নিয়মিত বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতাম, তরুণ সবার সামনে কথা বলতে ভয় কাজ করত। অথচ একদিন প্রতিযোগিতায় যাবার আগে ফাউন্ডেশনের একটা প্রোগ্রামে অংশ নেয়ার সুযোগ হলো। আমি অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, আমার আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে গেছে। খুব সহজেই ভালো যুক্তি মাথায় চলে এলো, সুন্দরভাবে

বিতর্ক শেষ করলাম এবং ১ম স্থান অর্জন করলাম।

এছাড়া বড় সাফল্য এসেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায়। এসময় আত্মবিশ্বাস ধরে রেখে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া কঠিন

হয়ে পড়ছিল আমার জন্যে। প্রতিদিন নিজেকে বলতাম, ‘আমাকে পারতে হবে।’ সেইসাথে মনোবল দেখতাম বুয়েটে ভর্তি হওয়ার পর কেমন অনুভূতি হবে, আমার মা-বাবা কতটা খুশি হবেন।

জীবনের কঠিন এই সময় সফলভাবে অতিক্রম করতে মনোবল মেডিটেশন আমাকে অনেক সাহস যুগিয়েছে। বুয়েটে ভর্তি হওয়ার পর উপলব্ধি করলাম, ভালোভাবে শেখার জন্যে আমাকে আরো পরিশ্রম করতে হবে। তাই প্রতিদিন চেষ্টা করি মেডিটেশন দিয়ে দিন শুরু করার।

[সারাফ মাহনাজ, ১ম বর্ষ, ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং, বুয়েট। ৩০০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



মা-বাবার প্রতি আমার শ্রদ্ধা-মমতা বেড়েছে

মুনতাসির রহমান

কোয়ান্টামে আসার আগে নিজের দেশ নিয়ে আমি খুব নেতিবাচক ভাব ভুগতাম। কোর্সে গুরুজীর আলোচনা শুনে বিশ্বাস করতে শুরু করলাম, আমাদের দেশের সম্ভাবনা অনেক।

এখন আমি নিজের দেশ নিয়ে প্রবলভাবে আশাবাদী।

আরেকটি বড় প্রাপ্তি হলো, মেডিটেশন চর্চা করে আমি মাইগ্রেন থেকে মুক্তি পেয়েছি। অথচ মাইগ্রেনের ব্যথার কারণে আমি একসময় পড়তে পারতাম না। মেডিকেল কলেজে চান্স পাওয়াটাও সম্ভব হয়েছে মেডিটেশনের জন্যেই। কারণ পড়াশোনার তীব্র চাপের মাঝেও আমাকে প্রশান্ত অবিচল থাকতে সাহায্য করে মেডিটেশন। তবে কোর্সের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি পারিবারিক সুসম্পর্ক।

কোর্সে পারিবারিক মেডিটেশনে অনুভব করলাম, মা-বাবার স্নেহ-ভালবাসা সন্তানের জন্যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। কোর্সের পরে মা-বাবার প্রতি আমার শ্রদ্ধা-মমতা আরো বেড়েছে।

[মুনতাসির রহমান, ৫ম বর্ষ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ। ২৭৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



সবার সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মিশতে পারি এখন

সাইফুল ইসলাম ইফতি

ক্লাস এইট-এ ওঠার পর প্রথমদিন স্কুলে গিয়ে দেখি ক্লাসের ছাত্ররা একে অপরের সাথে পরিচিত হচ্ছে, হাসিমুখে কথা বলছে। এক ছেলে হ্যান্ডশেক করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল। সে আমার বন্ধু হতে চায়।

কিন্তু আমি উত্তর দিলাম, ‘আমি কারো সাথে বন্ধুত্ব করি না।’ এতটা ই আত্মকেন্দ্রিক ছিলাম আমি।

কোর্স করার পরে অনুভব করলাম, চারপাশের সবাইকে সাথে নিয়ে বাঁচতে পারলেই জীবনটা সুন্দর হয়। আরো বুঝতে পারলাম, এই আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতাই হলো আমার সাফল্যের পথে বড় বাধা।

কোয়ান্টামের প্রোগ্রামগুলোতে দেখি, কোয়ান্টিয়াররা সবার সাথে আন্তরিকভাবে কথা বলেন, সবার সাথে খুব সহজেই মিশে যান। এটা দেখে আমার দীর্ঘদিনের জড়তা ভাঙতে শুরু করল। পড়ালেখার বাইরে অবসর সময়টুকুতে আমিও কোয়ান্টিয়ার হিসেবে কাজ করতে শুরু করলাম। এখন আমি সবার সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মিশতে পারি।

[সাইফুল ইসলাম ইফতি, ২য় বর্ষ, ঢাকা সিটি কলেজ। ৩৫১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



শুধু ভালো রেজাল্টধারী নয়, ভালো ছাত্র তিনিই—যিনি চৌকস, দক্ষ, নৈতিক ও মানবিক শক্তিতে উজ্জীবিত, আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু, অন্যদের ভরসাস্থল।

সহপাঠী মানেই বন্ধু নয়। সুসম্পর্ক থাকবে সবার সাথে। কিন্তু বন্ধুত্ব হবে তাদের সাথেই যাদের জীবন চেতনা ও লক্ষ্যের সাথে আপনার মিল রয়েছে।

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন ? উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : আমি বেশ মিশুক বলে মানুষের সাথে খুব সহজে বন্ধুত্ব ও ভালো সম্পর্ক হয়ে যায়। আত্মীয়স্বজন, পরিচিত ছোট ভাই, বড় ভাইয়েরা যে-কোনো বিপদে পড়লে আমাকে জানায় সাহায্য করার জন্যে। কাউকে ‘না’ বলতে পারি না। ফলে নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে পারি না। এ অবস্থায় আমার মেডিটেশন, লেখাপড়া এবং নিত্যানৈমিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধির কাজগুলো ব্যাহত হচ্ছে। ছুটির দিনগুলোতে বেশির ভাগ সময় এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকি, এমনকি ঈদের দিনও বাড়ি গিয়েছি সকালে। এভাবে চলতে চলতে নিজেকে দলছাড়া মনে হচ্ছে। মেডিটেশনে মনোযোগ দেয়া কঠিন হয়ে পড়ছে। মনে হচ্ছে প্রকৃতি আমাকে কম সাহায্য করছে। এ অবস্থায় কীভাবে আমি নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে অনন্য মানুষ হওয়ার পথে এগিয়ে যেতে পারি?

উত্তর : এই যে ‘না’ বলতে পারি না—এটা তো খুব বিপজ্জনক। প্রয়োজনে ‘না’ বলতে পারাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। অনেক বছর আগে একবার এক মেয়ে কাদতে কাদতে এসেছে আমার কাছে। জিজ্ঞেস করলাম, মা কী হয়েছে? বলল, ‘আপনি তো নেতিবাচক কথা বলতে নিষেধ করেছেন যে, ‘না’ বলা যাবে না। আমি তাই ‘হাঁ’ বলে দিয়েছি।’ ঘটনা হচ্ছে একজন তাকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছে। যদিও সে ঐ ছেলেকে পছন্দ করে না, কিন্তু ‘না’ বলা যাবে না বলে সে ‘হাঁ’ বলে দিয়েছে। আমি তখন বললাম, মা, এই ক্ষেত্রে ‘না’ বলাটাই হচ্ছে ইতিবাচক।

এই যে অন্যের উপকার করতে করতে আপনার লেখাপড়া মেডিটেশনসহ সব রুটিন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে, এটা তো ঠিক নয়। প্রয়োজনে সাহায্য করবেন, কিন্তু মাত্রাটা বুঝতে হবে। না হলে পরে একটা সময় আসবে যখন এই ছোট ভাই, বড় ভাইয়েরা আপনাকে তচ্ছল্য করবে। আপনি নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে পারেন নি বলে অবজ্ঞা করবে। সবসময় মনে রাখবেন, আপনি শিক্ষার্থী। আপনার জন্যে ফরজ কাজ হচ্ছে পড়াশোনা। অর্থাৎ যে সময়ের যে কাজ। এটা ঠিক রেখে আপনি যত পারেন উপকার করেন।

আপনার সামনে আসলে কোনো মনছবি নেই। আপনি শুধু ক্ষণিকের হাততালিতে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছেন। আর আপনার মতো এমন কাউকে দিয়ে কাজ করতে পারলে সবাই তেল দেয়, সবাই হাওয়া দেয় তার কার্যোদ্ধারের জন্যে। একসময় কাজ শেষ, দেখবেন হাওয়াও শেষ। তখন আফসোস করবেন। অতএব, সময় থাকতে সচেতন হোন। এমন কিছু করবেন না, যা আপনার পড়াশোনাকে নষ্ট করে, আপনার বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, আপনার কাজের ক্ষতি করে। নিজের পরিচয় সৃষ্টি করাটা গুরুত্বপূর্ণ। আর নিয়মিত মেডিটেশন করুন। মেডিটেশন করতে না পারার জন্যে কোনো অভ্যুহাত দাঁড় করাবেন না।

প্রশ্ন : বিয়ের ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম কী মনে করে—বিয়েটা কি ভাগ্য, নাকি মানুষ নিজেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে?

উত্তর : আসলে বিয়ের ক্ষেত্রে ভাগ্যের ওপরে নির্ভর করবেন না। কর্মের ওপরে নির্ভর করবেন। আপনার প্রস্তুতি প্রয়াস আর প্রচেষ্টার ওপর নির্ভর করবেন। যে-কোনো ব্যাপারে, যেমন : একটা ভালো চাকরি

পাওয়ার জন্যে আপনি চেষ্টা করেন, ভালো রেজাল্টের জন্যে চেষ্টা করেন, পরিশ্রম করেন। তাহলে বিয়ের জন্যেও তো আপনাকে চেষ্টা করতে হবে। আপনাকে একটা প্রোগ্রাম সেট করতে হবে। একটা পরিকল্পনা করতে হবে।

সবকিছুর জন্যে পরিকল্পনা করবেন আর বিয়েটাকে বলবেন ভাগ্য, তাহলে কীভাবে হবে? সমস্যা হলো, বিয়ের ব্যাপারে আমাদের কোনো পরিকল্পনা থাকে না, শুধু কল্পনা থাকে। এ ব্যাপারে আমরা শুধু কল্পনাই করি। তারপর কল্পনার সাথে গরমিল হলে ভাগ্যকে দোষারোপ করি।

তাই যারা বিয়ে করতে চান তাদের বিয়ের ব্যাপারটাও পরিকল্পনা করতে হবে যে, আমি কেমন জীবনসঙ্গী চাই, সেইসাথে নিজের যোগ্যতাটাও দেখতে হবে।

বিয়ের ব্যাপারে সবসময় বাস্তববাদী হবেন। কারণ, এই জায়গাটাতেই আমরা ভুল করি, বিয়ের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষের চিন্তাভাবনাই মোটামুটি বাস্তবতাবর্জিত। আর সবচেয়ে বড় অসুবিধাটা এখন হলো, টিভি সিরিয়াল দেখতে দেখতে আমাদের চিন্তাভাবনাও বায়বীয় হয়ে যাচ্ছে। আমরা মনে করি, জীবনটাও একটা টিভি সিরিয়াল। কিন্তু জীবনটা তো টিভি সিরিয়াল না। জীবন হচ্ছে লক্ষ্য, পরিকল্পনা এবং সেইভাবে কাজ—এই তিনের সমষ্টি।

বাস্তবতা হলো, বিয়েটা একটা প্রয়োজন। এই প্রয়োজন শারীরিক মানসিক পারিবারিক সামাজিক এবং আত্মিক। বিয়ে আর প্রেম এক বিষয় নয়। বিয়ে এবং প্রেমকে একাকার করে ফেলি বলোই আমরা ভুল করি। প্রেমিকা আর স্ত্রী এক নয়। তেমনি প্রেমিক আর স্বামীও এক নয়। প্রেমিক-প্রেমিকার কোনো দায়িত্ব নেই, শুধু রেস্টুরেন্টে ঘোরা ছাড়া।

কিন্তু বিয়ের পরে দায়িত্ব আছে। সকাল হলে নাশতার ব্যবস্থা কী হবে, এই দিয়ে দিন শুরু। স্বামী হলে তাকে নাশতার উপকরণ আনতে হবে। স্ত্রী হলে সেটি তৈরি করে পরিবেশন করতে হবে। তারপর আরো অন্যান্য দায়িত্ব তো আছেই।

এই বিষয়গুলো যখন বুঝবেন, অনুধাবন করবেন তখন দেখবেন যে, আর কোনো সমস্যা নেই। তখন আপনি বিয়েটাকে আর ভাগ্য মনে করবেন না। বিয়ের ব্যাপারে আপনার যথাযথ প্রস্তুতি থাকবে এবং আপনি সেভাবেই কাজ করতে পারবেন।

প্রশ্ন : প্রত্যেক প্রাণীকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে কি আমার জীবনসঙ্গী আগে থেকেই নির্ধারিত? যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে আমি খারাপ কাউকে পেলে আমার দোষ কোথায়?

উত্তর : আপনাকে তো কেউ দোষ দিচ্ছে না। আপনি খারাপ কাউকে পেলে যন্ত্রণা যা ভোগ করার তা তো আপনিই করবেন। আবার উল্টোটা ঘটলেও আপনিই সুখী হবেন। এখানে দোষ দেয়ার কিছু নেই।

আর প্রত্যেক প্রাণীকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করা হয়েছে মানে আপনাদেরকে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে নির্ধারণ করে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা নয়। এখানে জোড়া বলতে বোঝানো হয়েছে যে, বিপরীত এবং পরিপূরকরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা ব্যাপক অর্থে। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যেই নারী-পুরুষ অর্থে। যেমন, বিদ্যুতের নেগেটিভ পোল ও পজিটিভ পোল, দুটো পোল যদি না থাকে তাহলে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে না। এই জোড়া মানেও তাই, স্বামী-স্ত্রী নয়।

প্রশ্ন : আমি কোর্স করার পর থেকে নিয়মিত মেডিটেশন করছি। কিন্তু আমার মা বলেন, এখনো আমার মেজাজ ঠান্ডা হয় নি। কী করব গুরুজী?

উত্তর : আপনার মাকে বলুন যে, মা, তুমি দোয়া করো যেন আমার মেজাজ ঠান্ডা হয়। আসলে এই ক্রোধ সংবরণ করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সবসময় রাতে শোয়ার আগে সারাদিনের কার্যক্রমকে অবলোকন করবেন—সারাদিনে কি আপনি কারো সাথে রাগ করেছেন? দুর্ব্যবহার করেছেন? একবছর এভাবে আত্মপর্যালোচনা করুন। মেজাজ ঠান্ডা হয়ে যাবে। একবছর পরে দেখবেন, আপনার মা সার্টিফিকেট দিচ্ছেন যে, আমার সন্তান এখন আর রাগ করে না।

আসলে আপনার মেজাজ তো একদিনে গরম হয় নি। বছরের পর বছর ধরে গরম হয়েছে। এটা পুরোপুরি ঠান্ডা হতেও কিছু সময় লাগবে। কারো একমাসে ঠান্ডা হয়ে যায়, কারো ছয় মাসে, কারো—বা আবার নয় মাসে হয়। তাই আপনি সবসময় আত্মপর্যালোচনা করবেন, দেখবেন ঠিক হয়ে গেছে।

প্রশ্ন : আমার দুজন ভাই ও একজন বান্ধবী কোয়ান্টাম ল্যাবে গিয়েছিল রক্ত নিতে। ওরা রক্ত পায় নি। ওরা বলে, ‘তোমরা এত রক্ত দাও, কোয়ান্টাম কী করে? এগুলো কখন পাওয়া যায়?’ আমি কী উত্তর দেবো ওদের?

উত্তর : আপনার এখন কোনো উত্তর দেয়ার প্রয়োজন নেই। আগে একদিন কোয়ান্টাম ল্যাবে গিয়ে বসে থাকবেন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত। তাহলেই যে যা প্রশ্ন করুক আপনি উত্তর দিতে পারবেন। সেইসাথে বুঝতে পারবেন রক্তের জন্যে রোগী এবং তার স্বজনদের আকুতিটা কেমন। তখন আপনার পরিচিত যারা এ বিষয়ে প্রশ্ন করে, তাদেরকেও আপনি রক্ত দিতে উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন। বলতে পারবেন, এই রক্ত নিয়ে এইভাবে মানুষ বাঁচে।

ল্যাবে এলে আপনি দেখবেন, কতজন মানুষ রক্ত দিচ্ছে এবং কতজন রক্ত নিচ্ছে। রক্ত দিয়ে কী হচ্ছে তা—ও আপনি দেখতে পাবেন। কারণ এই রক্ত মুমূর্ষের প্রয়োজনে কাজে লাগানো ছাড়া আর কিছু করার উপায় নেই।

আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি, কোয়ান্টাম ল্যাব সারা বছর দিনরাত ২৪ ঘণ্টা মানুষের জন্যে কাজ করে যাচ্ছে এবং পরম করুণাময়ের রহমতে এ পর্যন্ত সাত লাখের বেশি মুমূর্ষের প্রাণ বাঁচাতে আমরা সাহায্য করেছি।

প্রতিদিন গড়ে প্রায় তিনশ ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান আমরা সরবরাহ করি। তারপরও দেড়শ-দুশ মানুষ রক্ত না পেয়ে খালি হাতে ফেরত যায়। কারণ ওটুকুই এখন পর্যন্ত আমাদের সামর্থ্য।

আপনারা যদি আপনাদের বন্ধুবান্ধবদের ল্যাবে এসে রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন, তাহলে কেউই রক্ত না পেয়ে ল্যাব থেকে ফিরে যাবে না।

এ মাসের অটোসাজেশন

যে নদী যত গভীর তার বয়ে
যাওয়ার শব্দ তত কম। আমি
কথার চেয়ে কাজ বেশি করব।

ফাউন্ডেশন সংবাদ

উচ্চতর বাচিক শিল্প কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মা-জী

সংস্কৃতির মূল শিকড় হলো ভাষা

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে শুরু হলো বাংলা বাচন পরিশীলন কর্মশালার দ্বিতীয় ধাপ-উচ্চতর বাচিক শিল্প কোর্স। ১২ সেপ্টেম্বর এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন শ্রদ্ধেয়া মা-জী মাদাম নাহার আল বোখারী।

উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত বাংলা বাচন পরিশীলন কর্মশালার ২১টি ব্যাচ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। পরবর্তীতে আবৃত্তি ও ধারাবর্ণনায় আগ্রহী

থাজুয়েট ও প্রো-মাস্টারদের মধ্যে থেকে দ্বিতীয় ধাপের জন্যে উত্তীর্ণ ৫৭ জনকে নিয়েই পরিচালিত হচ্ছে উচ্চতর বাচিক শিল্প কোর্স।

মা-জী বলেন, একটি জাতির অভিজাত্য ফুটে ওঠে তার সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে আর এই সংস্কৃতির মূল শিকড় হলো তার ভাষা। তাই এ কোর্সে অংশগ্রহণকারীরা বাংলা ভাষার সার্বিক প্রয়োগ ও শুদ্ধচর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন বলে



আমরা বিশ্বাস করি।

কোয়ান্টাম মেডিটেশন হলে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফাউন্ডেশনের পরিচালক-সমন্বয় মিসেস সুরাইয়া রহমান। স্বাগত বক্তব্য দেন কোয়ান্টাম মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক মোহাম্মদ মাহমুদুজ্জামান ও আভা সেলের প্রধান দায়িত্বশীল মীর রফিকুল ইসলাম এবং কর্মশালার পরিচালক নাট্য ও বাচন প্রশিক্ষক মো. গোলাম সারোয়ার।

৪৪ তম জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কোয়ান্টার

জাতীয় পর্যায়ে হ্যান্ডবলে রানার আপ আঞ্চলিক পর্যায়ে কাবাডিতে রানার আপ



কোয়ান্টাদের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ

৪৪ তম গ্রীষ্মকালীন জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জাতীয় পর্যায়ে হ্যান্ডবলে রানার আপ এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে কাবাডি-তে রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের শিক্ষার্থী কোয়ান্টারা।

হ্যান্ডবল ইভেন্টে থানা পর্যায় এবং জেলা পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়ে কোয়ান্টারা সুযোগ পায় উপ-আঞ্চলিক পর্যায়ে অংশ নেয়ার। এ পর্যায়ে ফাইনাল ম্যাচে নোয়াখালী আর কে নারায়ণপুর হাই স্কুলকে পরাজিত করে কোয়ান্টারা অংশ নেয় আঞ্চলিক পর্যায়ের খেলায়। কুমিল্লা উপ-অঞ্চল চ্যাম্পিয়ন কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট ইন্সপাহানী পাবলিক স্কুলকে ১২-৭

গোলে পরাজিত করে তৃতীয় বারের মতো আঞ্চলিক পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে কোয়ান্টারা। জাতীয় পর্যায়ে চূড়ান্ত পর্বে তিনটি ম্যাচের দুটিতে জয়ী হয় এবং একটিতে পরাজিত হয় কোয়ান্টারা। এর মধ্য দিয়ে জাতীয় পর্যায়ে রানার আপ পুরস্কার অর্জন করে। চ্যাম্পিয়ন হয়েছে গোপালগঞ্জের মকসুদপুর মৌলভী আব্দুল হাই মেমোরিয়াল হাই স্কুল।

কাবাডি-তে জেলা পর্যায়ে ফাইনালে বান্দরবান সরকারি হাই স্কুলকে ৫২-২৬ পয়েন্টে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়

কোয়ান্টারা। উপ-আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রথমে খাগড়াছড়িকে ও সেমিফাইনালে নোয়াখালীকে পরাজিত করে ফাইনালে উত্তীর্ণ হয় তারা। ফাইনালে চট্টগ্রামের শাহ ওয়ালিউল্লাহ হাই স্কুলকে ৮৭-৫৮ পয়েন্টে পরাজিত করে প্রথমবারের মতো উপ-আঞ্চলিক পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয় কোয়ান্টারা এবং আঞ্চলিক পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে।

সিলেটে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় কোয়ান্টারা কুমিল্লা উপ-অঞ্চলের কাবাডি দলের বিপক্ষে ৬৭-৪২ পয়েন্টে জয়ী হয় এবং ফাইনালে মৌলভীবাজার হাই স্কুলের সাথে ৩৯-৫১ পয়েন্টে পরাজিত হয়ে রানার আপ হয়।

ধানমণ্ডি শাখার উদ্যোগে বুলেটিন করসেবা

‘কোরবানির পশুর দাম প্রচার থেকে বিরত থাকুন’ এই আহ্বানকে ছড়িয়ে দিতে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন ধানমণ্ডি শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় বুলেটিন করসেবা। ১১ ও ১২ সেপ্টেম্বর দুই দিনব্যাপী এ করসেবায় ফাউন্ডেশনের প্রো-মাস্টার, থাজুয়েট ও এসোসিয়েটদেরকে কোরবানির বিষয়ে সঠিক ধারণা প্রদান এবং কোরবানির পশুর দাম বলা ও শোনার ব্যাপারে ধর্মীয় তাৎপর্য তুলে ধরে কোয়ান্টামের দৃষ্টিভঙ্গি জানানো হয়। সেইসাথে এ-সংক্রান্ত দিক-নির্দেশনা সম্বলিত কোয়ান্টাম বুলেটিন সেপ্টেম্বর সংখ্যা ১০৫০ কপি বিতরণ করা হয়। এছাড়াও পরিচিত সবাইকে এ বিষয়ে সচেতন করতে কোয়ান্টাম সদস্যরা বুলেটিনের প্রথম পৃষ্ঠা ফটোকপি করে তাদের চারপাশে ৪০ ঘরে বিতরণ করেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ওয়ার্কশপ



৩০ আগস্ট রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় মেডিটেশন সোসাইটি-র উদ্যোগে ডীনস কমপ্লেক্স কনফারেন্স হল-এ অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ শিক্ষার্থী ওয়ার্কশপ। ‘মেডিটেশন সাফল্যের নিশ্চিত পথ’ শীর্ষক ওয়ার্কশপে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২৩ জন শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষার্থী জীবনে মেডিটেশনের গুরুত্ব প্রসঙ্গে অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন ফাউন্ডেশনের অর্গানাইজার ইঞ্জি. প্রাণজিৎ লাল শীল এবং আডেন্টিয়ার ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আশিক মোসাদ্দেক। সমাপনী বক্তব্য দেন অধ্যাপক ড. মো. শহীদুল আলম।

আবশ্যিক

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের জন্যে শিক্ষক/শিক্ষিকা/আবাসিক শিক্ষক (ন্যূনতম অনার্স পাশ), বিজ্ঞান বিভাগের জন্যে (পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, জীব বিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত) শিক্ষক/শিক্ষিকা আবশ্যিক। বিএড ও নিবন্ধনকৃত প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। শিশুকানন ও শিশুসদনের শিক্ষার্থীদের দেখাশোনার জন্যে ব্রাদার, সিস্টার (ন্যূনতম এসএসসি পাশ) ও সিকিউরিটি গার্ড আবশ্যিক।

এছাড়াও কোয়ান্টামম-এর জন্যে কিছু সংখ্যক মালি, মাঠকর্মী প্রয়োজন। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন :

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক,
শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৪১৪৪১, ০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩

মেডিটেশন ও সুস্থ জীবনাচার করোনারি রক্কেজ নিরাময় করে

সঠিক জীবনদৃষ্টি, মেডিটেশন ও সুস্থ জীবনাচার করোনারি হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় করে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের এ আধুনিক ধারণার ওপর ভিত্তি করে যাত্রা শুরু করে কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব। মে ২০১০ থেকে এ পর্যন্ত ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়েছে হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় ওরিয়েন্টেশনের ৬০টি ব্যাচ, যেখানে অংশ নিয়েছেন দুই সহস্রাধিক মানুষ। তারা উদ্দীপিত হয়েছেন সুস্থতার সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিতে-‘জীবন আমার, সুস্থতার দায়িত্বও আমার’। সেইসাথে বুঝতে সক্ষম হয়েছেন নিজ নিজ হৃদরোগের কারণ এবং উদ্যোগী হয়েছেন সুস্থ জীবনাচার অনুসরণে।

হার্ট ক্লাবের দিক-নির্দেশনাগুলো দৈনন্দিন জীবনে যারা আন্তরিকতার সাথে অনুসরণ করেছেন, এনজিওপ্লাস্টি ও বাইপাস সার্জারি ছাড়াই কমতে শুরু করেছে তাদের রক্কেজের পরিমাণ। এছাড়াও হার্ট ক্লাবে আসার আগেই যারা এনজিওপ্লাস্টি কিংবা বাইপাস সার্জারি করেছেন তারাও এড়াতে পেরেছেন পুনঃরক্কেজের আশঙ্কা। সাম্প্রতিক চেক-এনজিওগ্রাম রিপোর্টের ভিত্তিতে তাদেরই কয়েকজনের অনুভূতি এখানে দেয়া হলো-

ডাক্তার বললেন, কেন এসেছেন? আপনার হার্টে তো কোনো সমস্যা নেই

মো. গিয়াস উদ্দীন

২০০৮ সালে ঘটনাচক্রে আমার হার্টের অসুখ ধরা পড়ে। এনজিওগ্রাম করে ডাক্তার বললেন, হার্টে দুটো রক্কেজ রয়েছে। ৭৫% ও ৪০%। দুটোতেই রিং লাগাতে বললেন। অথচ পরে জেনেছি, ৪০% রক্কেজের ক্ষেত্রে রিং পরানোর কোনো প্রয়োজনই নেই।



যা-ই হোক, যেহেতু তখন কোনো প্রস্তুতি ছিল না, তাই আর রিং লাগাই নি। পরবর্তী প্রায় এক বছর ওষুধ খেলাম। কিন্তু কোনো উন্নতি হলো না। বরং হার্টের সমস্যা আরো বেড়ে গেল। এর মাঝে আবার উচ্চ রক্তচাপ ধরা পড়ল। সবমিলিয়ে বেশ উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটছিল।

২০১১ সালে বিজ্ঞাপন দেখে কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের ওরিয়েন্টেশনে অংশ নিলাম। হার্ট সুস্থ রাখতে হলে যে সুস্থ জীবনাচার প্রয়োজন, সে-সম্পর্কে সচেতন হলাম। সেইমতো অনুসরণও করতে শুরু করলাম। একবছরে প্রায় ১২ কেজি ওজন কমল। কোলেস্টেরলের পরিমাণ অনেক বেশি ছিল, সেটা স্বাভাবিক অবস্থায় নেমে এলো।

এবছর আবার এনজিওগ্রাম করলাম। রিপোর্ট দেখে ডাক্তার বললেন, ‘আপনার হার্টে তো কোনো রক্কেজ বা অন্য কোনো সমস্যা নেই। আপনি কেন এসেছেন?’ রিপোর্টে দেখা গেল, রক্কেজ ৭৫% থেকে কমে ৫০-৬০%-এ নেমে এসেছে আর ৪০% রক্কেজ ছিল যে আর্টারিতে, তাতে কোনো রক্কেজই নেই! হার্ট ক্লাবের নির্দেশনা অনুসরণ করে আমি পুরোপুরি সুস্থ। উচ্চ রক্তচাপের ওষুধও আর খেতে হয় না।

[মো. গিয়াস উদ্দীন, ব্যবসায়ী]

আমার হার্ট এখন সুস্থ

মো. আশরাফ আলী

স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর জেনেও তেলভাজা ও উচ্চ চর্বিযুক্ত গুরুপাক খাবারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। খুব একটা শারীরিক পরিশ্রমও করা হতো না। এসব অনিয়মের প্রভাব টের পেলাম কিছুদিন পরেই।



ওজন বেড়ে ৯৫

কেজিতে দাঁড়াল। হঠাৎ একদিন বুকে ব্যথা অনুভব করলাম। তারপর চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলাম। এনজিওগ্রাম করে ডাক্তার জানালেন, হার্টের এলসিএক্স আর্টারিতে একটি রক্কেজ রয়েছে, যার পরিমাণ ৯০%। সেটিতে রিং লাগানো হলো।

এর কিছুদিন পর আমার ছেলের কাছ থেকে শুনলাম কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের কথা। হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় ওরিয়েন্টেশন-এ অংশ নিলাম। হার্ট ক্লাবের দিক-নির্দেশনা অনুসারে জীবনযাপন করতে শুরু করলাম। প্রতিদিন ভোরে উঠে নামাজ পড়ে মেডিটেশন করি। এরপর ৩০ মিনিট হাঁটি ও ৩০ মিনিট ব্যায়াম করি। পরিবর্তন এসেছে খাদ্যাভ্যাসেও। সব ধরনের মাংস, ফাস্টফুড ও কোমল পানীয় পুরোপুরি বর্জন করেছি। প্রতিদিন বাদাম, স্পিরলিনা, টক দই ও দেশি ফল খাই। এর সুফলও অনুভব করছি প্রতিনিয়ত।

ওজন কমে এখন ৮৩ কেজিতে নেমে এসেছে। এনার্জি লেভেল আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। সিঁড়ি বেয়ে অনায়াসে ছয় তলায় উঠতে পারি। এই তিন বছরে হার্টের কোনো অসুবিধা আর হয় নি। গত ৮ জুলাই চেক-এনজিওগ্রাম করাই। চিকিৎসকরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানালেন যে, আমার হার্টের এলসিএক্স আর্টারিটি এখন রোগমুক্ত এবং রিংয়ের আশেপাশে নতুন কোনো জটিলতাও তৈরি হয় নি।

[মো. আশরাফ আলী, সাবেক এম.ডি, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যাশিল্প কর্পোরেশন; সাবেক নির্বাহী পরিচালক, নাশা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ]

রক্কেজের পরিমাণ অনেক কমেছে!

সফিউল্যা

আট বছর আগে একদিন বুকে বেশ চাপ অনুভব করলাম। স্বাভাবিক হাঁটাচলাও কঠিন হয়ে পড়ল। এনজিওগ্রামে দেখা গেল, হার্টের একটি আর্টারিতে (এলসিএক্স) ৯৯% ও আরেকটিতে (এলএডি) ৭০% রক্কেজ। ডাক্তাররা দুটো আর্টারিতেই রিং পরানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু তা করাই নি।



এরপর থেকেই খাদ্যাভ্যাসের ব্যাপারে বেশ সতর্ক হয়ে গেলাম। একসময় কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের সদস্য হই এবং নিয়মিত দমচর্চা ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণসহ অন্যান্য বিষয়গুলো চর্চা শুরু করি।

দু-মাস আগে আবার এনজিওগ্রাম করাই। দেখা গেল, একটি রক্কেজের পরিমাণ ৯৯% থেকে ৩০-৪০% এবং অন্যটি কমে ৫০-৬০% হয়েছে! আগেরবার ডাক্তাররা দুটো রিং লাগানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন; কিন্তু এবারের রিপোর্ট দেখে শুধু ওষুধ চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন।

[সফিউল্যা, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিরাজীবী]

বেড়েছে আমার হার্টের কার্যক্ষমতা

মো. শফিউল্লাহ

২০১০ সালে এনজিওগ্রাম করে আমার হার্টের এলএডি আর্টারিতে দুটো রক্কেজ পাওয়া গেল। দুটোই ৯০%-এর বেশি। সাড়ে চার লক্ষ টাকা ব্যয়ে দুটো রিং লাগাতে হলো।



হাসপাতালে ১০ দিন কাটিয়ে বাড়ি ফেরার পর এক ধরনের আতঙ্ক আমাকে ঘিরে ধরল। মৃত্যুভয় পেয়ে বসল। এমনই এক দুঃসময়ে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিলাম। চার দিন পর আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি হলো। বিশ্বাস জন্মাল যে, আমি বাঁচব। এরপর হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় ওরিয়েন্টেশনে অংশ নিই। সেভাবেই মেডিটেশন, ব্যায়াম ও সঠিক খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুললাম।

গত ২৪ জুলাই আবার হার্ট চেক-আপ করলাম। দেখা গেল, যে দুটো রক্কেজে রিং লাগানো হয়েছিল সেই আর্টারি দুটো এখন রোগমুক্ত। ডাক্তাররা জানালেন, আমি এখন সুস্থ।

আগে ইকোকর্ডিওগ্রাম পরীক্ষায় আমার হার্টের ইজেকশন-ফ্ল্যাকশন ছিল ৫৫%। সম্প্রতি দেখা গেছে, এটি এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭০%-এ। সার্বিকভাবে আমার হার্টের কার্যক্ষমতা বেড়েছে।

[মো. শফিউল্লাহ, ব্যবসায়ী]

কোয়ান্টাম বুলেটিন : অক্টোবর ২০১৫ ॥ সম্পাদক : অধ্যাপিকা খাদিজা মাহতাব ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ **গুডেচ্ছা মূল্য - ৫ টাকা**
Phone : 9341441, 8319377, 9355756 Mobile : 01714-974333, 01711-671858, 09613-002025 ■ E-mail : bulletin@quantummethord.org.bd